‘তা সবে অবোধ আমি
অবহেলা করি...’

দিলরুবা শাহানা

যশোরের সাগরদাড়ির ইংরেজীশিক্ষিত জমিদারনন্দন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনের একটা সময়ে মাতৃভাষা বাংলাকে অবহেলা করেছিলেন। তারপর বোধোদয় যখন হল হাহাকার করে উঠলেন এই বলে
‘হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি...’।
আজ বাংলাভাষাকে নয় ইংরেজীভাষাটাকে আগ্রহ নিয়ে পড়িনি বলে বাংলাভাষার শক্তি, আবেগময় সৌন্দর্য, অতলস্পর্শী ভাব বুঝতে দেরী করেছি, সময় নিয়েছি অনেক।
আজ দুঃখ হয় ভেবে যে কেন বাবার কথার গুরুত্ব বুঝিনি তখন।
কবে সে একদিন স্কুলে পড়ার সময়ে। হেমন্তের পাতাঝরা এক বিকালের নরম সোনালী রোদে বারান্দায় বসে বই পড়ছি। বাবা ঘরের ভিতর থেকে দরজায় এসে দাড়ালেন। স্বল্পবাক, মৃদুভাষী বাবার সামান্য চাহিদা। তাও তেমন কিছু না। তৃষ্ণা ছিল চায়ের আর নেশা ছিল বইয়ের। বোধহয় চা চাইতেই এসেছিলেন। আমাকে বই পড়তে দেখে ভুলোমনা বাবা বরাবরের মতো ‘চা চাই’ বলতে ভুলে গেলেন। বই নিয়েই কথা শুরু করলেন এবং যা আমার একদম পছন্দ হয়নি তখন।
‘জীবনানন্দ পড়ছো, শুন জীবনানন্দের শক্তি বুঝতে হলে কীট্সও পড়বে তবেই বুঝবে তাঁকে। দেখিতো কোন কবিতা পড়ছো?’
সে সময়ে বাংলাই ভাল বুঝি কিনা নিশ্চিত নই তার উপর ইংরেজী পড়তে বলছেন! দারুন নাখোশ বা অখুশী আমি বললাম
‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাইনা আর’
‘দেখ নিজ দেশের জন্য কি রকম মায়া কবির, জগতের আর কোন রূপই তাঁকে টানেনা।’
বলেই বাবা ঘরে গিয়ে বুকশেল্ফ থেকে একটি পুরান চটি বই নিয়ে এলেন। হাল্কা জলপাইরঙ্গা শক্তমলাট খুলে একটা লাইন পড়লেন
‘Happy is England’
তারপর হাতের আঙ্গুল চিবুকে বুলিয়ে আকাশে তাকিয়ে যেন আপনমনেই বললেন ‘এখানেও দেখ কীট্সের লাইনে আপন দেশের জন্য দরদ কি রকম ঝরে পড়ছে, তাঁর কাছেও সুখ মানেই স্বদেশ ইংল্যান্ড।’

বলার শেষে আমার হাত থেকে জীবনানন্দ সমগ্রটাও নিয়ে নিলেন। তারপর বই দু’টো নিয়ে ঘরের ভিতর চলে গেলেন।

আমার পড়া ক্ষান্ত হল। কি আর করা। বাবার জন্য চা বানানোই এখন কাজ। যদি চা পেয়ে বইয়ের দখল ছাড়েন। আমি চা নিয়ে গিয়ে দেখি বাবা বিছানায় আধশোয়া ভঙ্গিতে কীট্স আর জীবনানন্দে আকণ্ঠ ডুবে আছেন। বিছানার পাশের ছোট্ট টেবিলে শব্দ করে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলাম। ইচ্ছাকৃত শব্দ যাতে বাবার পড়ার ঘোর কাটে। ঘোর ঐ মুহূর্তে কাটেনি।

আমিও ইংরেজ কবি জন কীটস্‌ের জলপাইরঙ্গা বই খুলে পড়িনি ঐ বয়সে কোনদিন।

পরে জানলাম কীট্স বড়মাপের কবি। প্রভাবিত করেছেন অনেককে। অনেকের মতে জীবনানন্দও কীট্সের প্রতি মোহগ্রস্থ ছিলেন।

ইংরেজীতেও পড়ার আনন্দ খুঁজে পেয়ে দেখলাম বাংলা আরও মনোরম, আরও গভীরভাবে হৃদয়ছোঁয়া। যেমন ধরা যাক যদি কীট্সের মত জীবনানন্দও লিখতেন ‘সুখের অপর নাম বাংলা আর বাংলা মানেই সুখ’ তা কি ‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাইনা আর’এর মত মনোহর হত?

তবে বাংলা ছাড়াও অন্যভাষাতেও আজকাল বাংলার বিষয়বস্তু পাওয়া যাচ্ছে যা এক সুসংবাদ। বাংলাভাষীরাও অনেকে ইংরেজীতে দাপটের সাথে লিখছেন। ইংরেজী ভাষাতেও বাংলার অনেক রত্নরাজী খুঁজে পেয়ে আনন্দিত হবেন, অভিভূত হবেন অনেকে। আমার ছেলেবেলার মতো বোকামী করে জীবনানন্দ পড়ছিইতো কীট্স পড়ার কি দরকার বললে ঠকতে হবে।

যারা বাংলায় পড়তে পারেন না তাদের উৎসাহিত করা হউক ইংরেজী বা অন্যভাষাতে হলেও নিজের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাহিত্য সম্বন্ধে জানার ও নিজেকে ঋদ্ধ করার। না হলে মধুকবির মত আপনসত্তা একদিন ‘অন্ধকারে জেগে উঠে’ হাহাকার করবে হয়তো ‘তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি...’। এ ‘অন্ধকার’ শাব্দিক অর্থে অন্ধকার নয়; অজানা থাকার অন্ধকার, আপন ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অজ্ঞতার অন্ধকার।